"ফজলুল কাদের চৌধুরী একটি সমীক্ষা"

কাজী মোহাম্মদ ইউসুফ

১৮ ই জুলাই ১৯৭৩ সাল। সন্ধ্যাকাল। দিনান্তে দিবাকর দিগন্তে ডুবু ডুবু। তার কিছু আলো এসে পড়েছে একটি সুন্দর সুঠাম মুখের উপর। সুদীর্ঘ সবল দেহে পায়চারি করছেন কারারুদ্ধ মহান জননেতা। স্থান ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের শেলগুলোর সামনে সামান্য জায়গা। সিগারেট টেনে মুখ ভরা ধুঁয়ো ছেড়ে তিনি চরম অবজ্ঞা দেখাচ্ছিলেন কারা জীবনের আনুষাঙ্গিক দুঃখ যাতনার প্রতি। সেখানে আরো কয়েকজন নেতা ছিলেন তাঁদের অনেক আশা নিয়ে। অনিশ্চিত ভবিষ্যতে এই সুন্দর সুদীর্ঘ জননায়ক অনেকের মনে অনেক আশার আলোর সঞ্চার করলেন। দৈহিক এবং নৈতিক কোন দুর্বলতার চিহ্ন তাঁর মধ্যে ছিল না। দৃঢ় সংকল্প স্থির প্রত্যয় মূর্ত ছিল তাঁর সারা দেহে। এর আগে তিনি দর্শকদের আশ্বস্থ করছিলেন" সবুর কর, অবস্থা ভালোর দিকে বদলাবে।

সূর্য্য ডুবে গেল আঁধার নেমে এলো। বন্দীরা আপন আপন সেলগুলোতে ঢুকে পড়লেন। এই পুরুষ সিংহকে ও খাঁচায় আবদ্ধ করা হল। বেপরোয়া দুর্জয় সাহসে মনোবল তাঁর সম্পূর্ণ ছিল।

রাত আটটার দিকে তাঁকে খাবার দেওয়া হলো। কোন মতে চারটা খেয়ে তিনি কর্তৃপক্ষের দেওয়া একটি কলা খেলেন। কলাটি গিলার সাথে সাথেই তাঁর সারা শরীরে প্রচন্ড আলোড়ন সৃষ্টি হল – তিনি বমি করলেন, লাল, লাল রক্ত বমি – "কলা খেয়ে আমার একি হল" বলে তিনি চিৎকার করে উঠলেন। তিনি দাঁড়ালেন এদিক সেদিক হাতড়ালেন, পানি পানি করে ডাক দিলেন। অবশেষে একটি জানালার রড ধরলেন – তারপর মাটিতে পড়ে গেলেন। তখন সব শেষ।

ডাক্তার আর কারারক্ষীরা এসে তাঁর মৃতদেহ হাসপাতালে নিয়ে গেলেন এবং সেখানে তাঁকে বাঁচাবার জন্যে যথোপযুক্ত চিকিৎসা শুরু হলো। সহবন্দী জনাব মাহবুবুল হক হাসপাতালে এসব মরার উপর খাড়ার ঘা– দেখে অত্যন্ত ব্যথিত চিত্তে হাসপাতালে লোকজনদের আর কোন কষ্টই না করার জন্য অনুরোধ করলেন।

জনাব হক কোন এক সূত্র ধরে তাঁর মৃত্যুর খবর ঢাকার একটি প্রভাবশালী দৈনিকের কাছে পাঠালেন। এরপরের দিন পত্রিকার এক কোনায় বের হলো – কারাগারে জনাব ফজলুল কাদের চৌধুরীরএন্তেকাল।

তাঁর মৃত্যুর খবর নানা বাধা বিঘ্নের মধ্যে দেশের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়লো। দেশবাসী বিস্মিত, স্তম্ভিত, হতবাক হলো এই মর্মান্তিক মৃত্যুতে। বুক ফাটা কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো এদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ আবাল–বৃদ্ধ–বণিতা।

তাঁর মৃতদেহ যখন পতেঙ্গা বিমান বন্দরে পৌঁছলো শোকার্ত লক্ষ জনতা তাঁদের প্রিয় মরহুম নেতার লাশকে নিয়ে মিছিল সহকারে যখন তাঁর বাসভবনের দিকে এগিয়ে আসছিল সেদিনের দৃশ্য

কেউ ভুলতে পারবে না। পতেঙ্গা থেকে চৌধুরী বাসভবন প্রায় বার মাইলের পথ। এই সুদীর্ঘ পথে কোথাও তিল ধারনের জায়গা ছিল না। কেবল মানুষ আর মানুষ অতলান্ত মানুষের সমুদ্র।

প্রায় চার ঘন্টা সময় লেগেছিল জনাব চৌধুরীর শবদেহ বাহী মটরটি গুডস হিলে পৌছতে। তারপর সারা রাত স্রোত আসে আর যায় – তাদের প্রিয় নেতার লাশ দেখে অশ্রু ফেলে করুণ আর্তনাদ করে আল্লার কাছে ফরিয়াদ জানায় – কেন এমন হলো – আল্লাহ তুমি বিচার করো – তুমিই সর্বশক্তিমান। বেলা দশটায় প্যারেড গ্রাউন্ডে তিল ধারণের জায়গা ছিল না। রাস্তায় জনতা, দালানে জনতা, গাছ–গাছালিতে জনতা, লক্ষ লোক, সকল শ্রেণীর লোক শিক্ষিত–অশিক্ষিত আলেম–ওলামা, পীর–দরবেশ, সাধারণ মানুষ সবাই মিলে মহান নেতার নামাজে জানাজা আদায় করলেন।

তারপর তাঁর পারিবারিক গোরস্থান গহিরাতে মরদেহ পৌছলে জনতার সমুদ্র আবারও তাঁর জানাজার নামাজ আদায় করেন। জন্মসূত্রে গহিরার মাটিতে দাফন করা হলো "শেরে পাকিস্তান" মরহুম ফজলুল কাদের চৌধুরীর লাশ। ক্রন্দনরত জনতা দু'হাত তুলে তাঁর মাগফেরাত কামনা করলেন এবং এখনো তাঁর মাজারে প্রতিদিন শত শত লোক অবিরাম জেয়ারত করে চলছেন। নেতা চলে গেছেন কিন্তু নেতৃত্বের বলিষ্ট স্বাক্ষর জনমনে চির ভাস্বর হয়ে রইলো।

জনাব চৌধুরীর মৃত্যুর আনুসংগিক অবস্থা রহস্যের সৃষ্টি করেছিল এবং নানা প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে।

দৈনিক বাংলার কলামিষ্ট – অনিকেত লিখেছেন – অতি সম্প্রতি চট্টগ্রামে গেলে আপনাকে যে প্রশ্নটির জবাব দিতে হবে সে প্রশ্ন হচ্ছে ফজলুল কাদের চৌধুরীর মৃত্যু নিয়ে। তাঁর মৃত্যু সংবাদটি কি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নিয়মিত সময়ে দিতে পারতেন না? পারতোনা কি বাংলাদেশ বেতার এক মিনিটের একটু সংবাদ পরিবশেন করতে? বিচারে যার দন্ড হলে বার বার বেতার কর্তৃপক্ষ প্রচার করতে পারত তার মৃত্যু সংবাদটি কি আদৌ কোন সংবাদ নয়? সংবাদ কি কে কোথায় বলেছে তাঁর চির পরিচিতি দৈনিকবিবরণী?

চট্টগ্রাম গেলে এ প্রশ্নটি সকলের মনে দেখা দেবে। মনে হবে সংশ্লিষ্ট মহলের এই নিম্নতম করণীয়টুকু করার ব্যর্থতার জন্য ফজলুল কাদের চৌধুরীর মৃত্যু সম্পর্কে বিরাট সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছে। আর সাথে সাথে সংবাদ পত্রে চোখে পড়বে ফজলুল কাদের চৌধুরী–এর স্ত্রীর পত্র। তিনি অভিযোগ করেছেন যে বঙ্গবন্ধু নাকি ১৮ই জুলাই রাত ১১টায় তাঁর স্বামীর মৃত্যুর খবর তাঁর পরিবারকে জানাতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাহলে সেটা ঘটলো না কেন। আর পত্রিকাগুলিও এ সংবাদটির সঠিক সূত্র পেল না কেন? সে জন্য দায়ীকে, চট্টগ্রাম গেলে এ প্রশ্ন এড়াতে পারবেন না।

দৈনিক ইত্তেফাক লিখেছেন – জনাব চৌধুরীর মৃত্যু সম্পর্কে – বিস্তারিত খবরের জন্য জেল কর্তৃপক্ষের সংগে টেলিফোনে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করিয়াও কিছু জানা যায় নাই।"

সম্পাদকীয় মন্তব্যে সাপ্তাহিক "হলিডে" লিখেছেন –

The death of Mr. Fazlul Quader Chowdhury has touched off wild speculation. The speculation range from deliberation to negligence.

জনাব চৌধুরীর লাশ যারা দেখেছেন তারা জানেন এমন সুন্দর মানুষটির গায়ের রং কয়লার মত কালো হয়ে গিয়েছিল। কেন এমন হলো – এই প্রশ্ন থেকে গেলো।

জনাব এ. কে. এম. ফজলুল কাদের চৌধুরী ১৯১৯ সালের ২৬শে মার্চ চট্টগ্রামের গহিরা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্ব পুরুষেরা ১৮ শয়াকিতে সুদুর বাগদাদ থেকে এসে এখানে বসতি স্থাপন করেন। তাঁর আম্মার দাদীজান বেগম রহিমুনেচ্ছা একজন প্রসিদ্ধ মহিলা কবি ছিলেন।

জনাব চৌধুরী প্রেসিডেন্সী কলেজে এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে অধ্যয়ন সমাপ্ত করেন পরে তিনি ঢাকা হাইকোর্টের এডভোকেট হন।

রাজনৈতিক এবং সামাজিক নানা ঘটনা প্রবাহের সাথে তাঁর জীবন একান্তভাবে জড়িত এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে তিনি অবিস্মরণীয় অবদান রেখে গেছেন।

ছাত্র নেতা হিসাবে এবং আজাদী আন্দোলনে তিনি অনবদ্য স্বাক্ষর রেখে গেছেন। পাকিস্তান আন্দোলনে বৃটিশ সরকার মুসলিম লীগারদের মধ্যে তাঁকেই সর্বপ্রথম কারারুদ্ধ করেন।

১৯৩৮ সাল থেকে তিনি কায়েদে আজমের নেতৃত্বে কাজ করতে থাকেন। সেই সময়ে তিনি কারমাইকেল হোস্টেলের প্রধান নির্বাচিত হন এবং হলুয়েল মন্যুমেন্ট অপসারণ আন্দোলনে তিনি ছাত্রদের নেতৃত্ব দান করেন। ১৯৪১ সালে আলীগড়ে তিনি মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। মাহমুদাবাদের রাজা সাহেব ছিলেন তখন এই সংস্থার সভাপতি।

১৯৪১ সালে কায়েদে আজমের নির্দেশ অমান্য করে কতিপয় মুসলিম নেতার বৃটিশ ভাইসরয়ের ডিফেন্স কাউন্সিলে যোগদানের বিরুদ্ধে তিনি কলিকাতায় বজ্রকণ্ঠে আওয়াজ তুলেন। বাংলাদেশে মুসলিম লীগ মন্ত্রী সভার পতন হলে বরিশালে মুসলিম লীগের যে সম্মেলন হয় তাতে তিনি সভাপতিত্ব করেন। খাজা নাজিমউদ্দিন এবং হোসেন শহীদ সরওয়ার্দী এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। এর আগে একই সালে শিলং মুসলিম ছাত্র সম্মেলনেও তিনি সভাপতিত্ব করেন।

পাকিস্তানের বাণী ঘরে ঘরে পৌছিয়ে দেবার জন্যে তিনি যখন সারা বাংলা সফর করছিলেন তখন ফরিদপুরে বৃটিশ সরকার তাঁকে গ্রেফতার করে ছয়মাসের কারাদন্ড দেন। পরে বৃটিশ সরকার বহু জেলায় তার প্রবেশের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করলেন এবং তাঁকে বক্তৃতা বিবৃতি প্রদান থেকে বিরত করা হলো। বাংলাদেশের মুসলিম ছাত্র সমাজকে সংঘবদ্ধ করার জন্য বিভিন্ন নেতাদের সমন্বয়ে গঠিত এডহক কমিটির তিনি সম্পাদক নিযুক্ত হলেন। ১৯৪৩ হইতে ১৯৪৭ সাল পর্য্যন্ত তিনি চট্টগ্রাম জিলা মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। তখন তিনি পাকিস্তান আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য

হাজার হাজার যুবক নিয়ে ন্যাশনাল গার্ড সংগঠন করেন। সিলেট রেফারেন্ডামে এই সব গার্ড নিয়ে রাত দিন পরিশ্রম করে সংগ্রামে জয়ী হয়েছেন।

জনাব চৌধুরী চট্টগ্রাম চেম্বার অব কর্মাস প্রতিষ্ঠা করেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন ধরনের অযৌক্তিক কর আরোগের বিরুদ্ধে সক্রিয় আন্দোলন করেন। জনাব চৌধুরী দেশের শ্রমিক আন্দোলনে ও সক্রিয় অংশ গ্রহন করেন। চট্টগ্রাম ও ঢাকায় ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করেন। আদমজী জুট মিল লেবার ইউনিয়নের সভাপতি হিসাবে এবং পূর্ব পাকিস্তান জাহাজী শ্রমিক ইউনিয়নের প্রধান হিসাবে তিনি শ্রমিকদের ভাগ্য উন্নয়নে যথেষ্ট অবদান রেখে গেছেন। জাহাজী শ্রমিকদের জন্য তাহাদের বেতনের অর্ধেক পেনশন হিসাবে দেওযার দাবী আদায় করিয়া দেন।

তিনি চট্টগ্রাম জেলা বোর্ডের সাত বছর যাবত চেয়ারম্যান ছিলেন এবং চট্টগ্রাম স্কুল বোর্ডের তখন প্রেসিডেন্ট ছিলেন।

১৯৫৮ সালে তিনি স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদে বিপুল ভোটাধিক্যে নির্বাচিত হন। মুসলিম লীগ ও যুক্তফ্রন্ট প্রার্থী তার কাছে শোচনীয় পরাজয় বরন করেন।

১৯৬২ সালে পাকিস্তান জাতীয় পরিষস সদস্য নির্বাচনে আবার নির্বাচিতহন। এবারে তিনি প্রেসিডেন্টের মন্ত্রীসভায় যোগদান করেন। তিনি একযোগে খাদ্য, কৃষিও সমাজ কল্যাণ শিক্ষা,তথ্য, ও বেতার, স্বাস্থ্য ও শ্রমকল্যান মন্ত্রী রূপে কাজ করেন। তখন দেখা গিয়েছে জনাব চৌধুরীর অপূর্ব কর্মদক্ষতা। ১৯৬৩ সালে তিনি আবার জাতীয় পরিষদে নির্বাচিত হন। সেই বৎসরই সর্বসম্মতিক্রমে তিনি পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের স্পীকার নির্বাচিত হন। স্পীকার হিসাবে তার নিরপেক্ষতা এবং পরিষদ পরিচালনায় নৈপূণ্য সকলকে সম্মোহিত করে। প্রেসিডেন্ট আইউবের অনুপস্থিতিতে অনেকবার পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট এর গুরুদায়িত্ব পালন করেন।

১৯৬৫ সালে আবার ও তিনি পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে নির্বাচত হন। তাঁর একমাত্র প্রতিদন্ধি এবার জামানত হারান। জনাব চৌধুরীর কর্মবহুল জীবন জাতির সেবায় নিয়োজিত ছিল। তিনি কোনদিন আদর্শচ্যুত হননি। দেশ ও দশের ভালবাসা তাকেঁ আজীবন উদ্বুদ্ধ করেছিল। জনাব চৌধুরী এদেশের রাজনৈতিক জীবনে একজন ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ। এদেশের প্রত্যেকটি জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে জনাব চৌধুরীর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

তিনি চলে গেছেন– কিন্তু রেখে গেছেন তাঁর আদর্শ, অকৃত্রিম জনসেবা অফুরন্ত দরদ এবং জনগনের জন্য প্রাণঢালা ভালবাসা।

আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত তার কবরকে রহমতের নুরে উদ্ভাসিত করুক এই আমাদের কামনা। আমীন।